ISBN 81-237-0557-3
প্রথম প্রকাশ : 1983 (শক 1905)
পঞ্চম মুদ্রণ : 2002 (শক 1923)

Chhotoder Bangla Natak (*Bangla*)
মূল্য : 14.00 টাকা
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

নেহরু বাল পুস্তকালয়

ছোটদের বাংলা নাটক

সংকলন

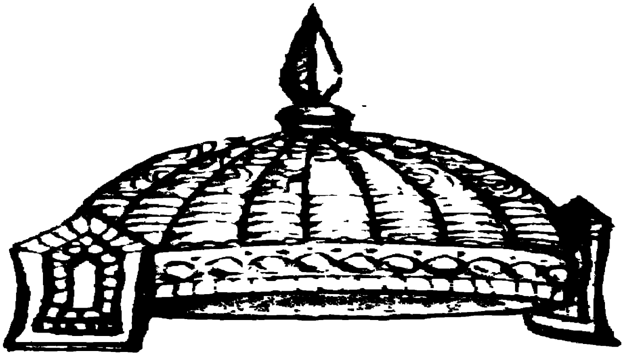
সমর চট্টোপাধ্যায়

ছবি

শৈল চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া





মুকুট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্রগণ

অমরমাণিক্য ॥ মহারাজ
চন্দ্রমাণিক্য ॥ যুবরাজ
ইন্দ্রকুমার ॥ মধ্যম রাজকুমার
রাজধর ॥ কনিষ্ঠ রাজকুমার
ধুরন্ধর ॥ ঐ মামাতো ভাই
ইশা খাঁ ॥ সেনাপতি
আরাকান-রাজ
প্রতাপ
নিশানধারী ভাট, দূত, সৈনিক প্রভৃতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ। ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ। ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত

রাজধর : দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলছি, তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ : তবে কী ধরে ডাকব? চুল ধরে, না কান ধরে?

রাজধর : আমি বলে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ, তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ : আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর : তাই যদি রাখতে চাও তা হলে ভবিষ্যতে আমার নাম ধরে ডেকো না।

ইশা খাঁ : বটে!

রাজধর : হাঁ।

ইশা খাঁ : হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী বলে ডাকতে হবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা!

রাজধর : আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ : সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে কথা মনে রাখা শক্ত করে তুলেছ।

রাজধর : তুমি যে আমার ওস্তাদ, সে কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ইশা খাঁ : বস। চুপ।

[দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার : খাঁ-সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ইশা খাঁ : শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই-যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ, এঁকে জাঁহাপনা শাহেনশা বলে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না—ওঁর সম্মানের এত টানাটানি!

ইন্দ্রকুমার : বল কী! সত্যি নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর : চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার : তোমাকে কী বলে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা! হা হা হা হা! শাহেনশা!

রাজধর : দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার : জনাব, চুপ করে থাকা বড়ো শক্ত—হাসিতে যে পেট ফেটে যায়, হুজুর।

রাজধর : তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার : ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক্, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ইশা খাঁ : ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার : নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না—মই লাগাতে হবে।

[অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ]

রাজধর : মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ : কী হয়েছে?

রাজধর : ইশা খাঁ পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ইশা খাঁ : অসম্মান কেউ করে না—অসম্মান তুমি করাও। আরো তো রাজকুমার আছেন, তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও

মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র—সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ : সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা করে চলতে হবে বৈকি।

ইশা খাঁ : মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন তখন মহারাজকে যে-রকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর : অন্য কুমারদের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ : চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাফ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুন্‌শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাও তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো করে আছেন।

মহারাজ : রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলছেন! তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পারো নি?

রাজধর : সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ : আচ্ছা, উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব। [প্রস্থান]

ইশা খাঁ : শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তানের মতো কথা বলেছ। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তুমি হারো, তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না—হার-জিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর : থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এতদিন তা না পেয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে, তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ : রাগ কোরো না ভাই রাজধর। সেনাপতি-সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা হলে দেখবে, খাঁ-সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত করবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর : দাদা, আজ পূর্ণিমা আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার করতে গেলে হয় না ?

যুবরাজ : বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার : কী আশ্চর্য ! রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হল ! এমন তো কখনো দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ : ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই ! উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার করে বেড়ান। রাজসভায় দুই-পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো না কোনো ফাঁদে আটকা না পড়েছেন।

যুবরাজ : সেনাপতি-সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার—যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না করে ফেরে না।

রাজধর : দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ-সাহেব জিহ্বায় যতই শাণ দিন-না কেন, আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ : তোমার মর্ম পায় কে বাবা ! বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার : যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার শখ হল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ : আহা ইন্দ্রকুমার, প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

রাজধর : সে আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার : দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত নাকি ?

যুবরাজ : তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার করতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো

জন্তু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁঠাল শিকার করেই মরি।

ইশা খাঁ : (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) যুবরাজ ঠিক বলেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে—তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে!

ইন্দ্রকুমার : না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার করতে যাবে!

যুবরাজ : আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছা হয়েছে, ওঁকে নিরাশ করব না।

ইন্দ্রকুমার : কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হয়েছে বলে কি যেতে নেই?

যুবরাজ : সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার : তাই বুঝি পুরোনো হয়ে গেছে?

যুবরাজ : আমার কথা অমন উল্টো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার : না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম—চলো প্রস্তুত হই গে।

ইশা খাঁ : ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে, কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

অনুচরগণ; প্রথম : কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটো কুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে—ইনি মধ্যম কুমারের সঙ্গে অস্ত্রপরীক্ষায় এগোতে চান, এর মানে কী?

দ্বিতীয় : কেউ-বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ-বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম : সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও, সেটা যে দুষ্টবুদ্ধি।

তৃতীয় : দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক, মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিয়ো না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ করে থাকো।

দ্বিতীয় : বনমালী ঠিক কথাই বলেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই

তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল। রাজার ছেলে কে ভালো কে মন্দ সে বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম : ইচ্ছে করে তো আনি নে! আমাদের মধ্যম কুমার সরল মানুষ—মনে তাঁর ভয়ডরও নেই, পাকচক্রও নেই—সর্বদাই ভয় হয়, ঐ যার নামটা করছি নে তিনি কখন তাঁকে কী ফেসাদে ফেলেন।

দ্বিতীয় : চল্ চল্, ঐ আসছেন।

প্রথম : ঐ-যে সঙ্গে ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন, শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান। রাজধর ও ধুরন্ধরের প্রবেশ]

রাজধর : অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর : কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চলছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর : লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী? যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্য ভেদ করব।

ধুরন্ধর : ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর : বক্ষে নয়, তাঁর হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করব।

ধুরন্ধর : অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে, এইটেকেই সুযোগ বলছ?

রাজধর : সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে।

ধুরন্ধর : কাজ তো তোমার বরাবরই করে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর : ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নাম-লেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নাম-লেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তার সঙ্গে আমার তীর বদল করতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর : সবই যেন বুঝলুম, কিন্তু আমার প্রাণটি ? সেটি গেলে তো কারো সঙ্গে বদল চলবে না।

রাজধর : তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর : তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভয়ও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রূপোর পাত দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ করলে, আমিই তো সেটি সংগ্রহ করে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম—শেষকালে যখন ধরা পড়লে, ইন্দ্রকুমার ঘৃণা করে সে ধনুকটা তোমাকে দান করলেন, কিন্তু আমায় যে অপমানটা করলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখন তো ভাই, তুমি ছিলে, রক্ষা যত করেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর : এবার তোমার সময় এসেছে, সেই অপমানের শোধ নেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর : সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো ; শোধ তোলবার শখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ-যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি বলবেন তাতে মধুবর্ষণ করবে না—আর ইশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করবেন এমন ভরসা আমার নেই। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বারে

ইন্দ্রকুমার : কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী! আমাকে হঠাৎ অস্ত্রশালার দ্বারে যে ডাক পড়ল ?

প্রতাপ : মধ্যম বউরানীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন যে আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু অস্ত্র, না নাগপাশ, না কী, সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার : বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি ?

প্রতাপ : আজ্ঞে কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার : তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে! (দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ) এ কী! রাজধর যে! হা হা হা হা, তোমাকে অস্ত্র বলে কেউ ভুল করেছিল নাকি! হা হা হা হা!

রাজধর : মেজবউরানী তামাশা করে আমাকে এখানে বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার : এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না—এখানকার তামাশা যে ভয়ঙ্কর ধারালো তামাশা—এখানে তোমার আগমন হল যে ?

রাজধর : আজ রাত্রে শিকারে যাব বলে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম, আমার অস্ত্রগুলোতে সব মরচে পড়ে রয়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সাফ করতে দিয়ে এসেছি। তাই বউরানীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার : তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে বসে আছেন! হা হা হা হা! তা বেরিয়ে এলে কেন ? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে নাকি ? হা হা হা হা!

রাজধর : হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে। [প্রস্থান]

প্রতাপ : ছোটো কুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার : ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের? উনিও ঠাট্টা করুন না।

প্রতাপ : ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পরীক্ষাভূমি। রাজা, রাজকুমার, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট

ইন্দ্রকুমার : দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ : চলবে না তো কী? আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎ-সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর, যদিবা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার : দাদা, তুমি যদি হারো তবে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ : না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ : যুবরাজ, সময় হয়েছে—ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ করো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

[যুবরাজের তীর নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ : যাঃ ফসকে গেল।

যুবরাজ : মনোযোগ করেছিলুম খাঁ-সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার : কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।



ইশা খাঁ : তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না তা জান ? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি-সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ : (রাজধরের প্রতি) কুমার এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর : আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ : এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

[রাজধরের তীর-নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ : যাক, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

যুবরাজ : ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর : লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ : না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর : আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। কাছে গেলেই প্রামণ হবে।

[ইন্দ্রকুমারের ধনুক গ্রহণ]

যুবরাজ : (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই, আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

[ইন্দ্রকুমারের তীর-নীক্ষেপ। নেপথ্যে জনতা : 'জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়'। বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন]

ইশা খাঁ : পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর : না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ : কখনোই না।

রাজধর : সেনাপতি-সাহেব, পরীক্ষা করে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ : আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান। তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

ইশা খাঁ : (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার : হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ : দেখি। তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর : আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ : কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার : আমি বুঝেছি।

রাজধর : মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার : (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে যে মুখে চুনকালি পড়বে ; বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না—অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ : কী হয়েছে বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো, কী হয়েছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর : কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ : তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার : সে কথার প্রয়োজন নেই খাঁ-সাহেব।

ইশা খাঁ : ঠিক করে বলো বাবা, তুমি নিশ্চয় জান, কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমা. : চুপ করো খাঁ-সাহেব। ও কথা থাক্।

ইশা খাঁ : তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার : হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ : শাবাশ বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হচ্ছে না। আর একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর : খাঁ-সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার

করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যম-কুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ : সে কথা আমি বলতে পারি নে—তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও। [তলোয়ার প্রদান]

রাজধর : পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

[ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ]

ইন্দ্রকুমার : (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্ ! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে ?

ইশা খাঁ : (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী ? ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর ! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার : (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ : পুত্র, এ কী পুত্র ! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ !

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি-সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ : ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার : (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ : মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে, তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ : কোন্ কাজের কথা বলছ সেনাপতি ?

ইশা খাঁ : আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের কথা। আমাদের

সৈন্যও তো প্রস্তুত আছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ : ভালো কথাই বলেছ, সেনাপতি। বারবার শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল বৎসগণ? আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ কি?

ইন্দ্রকুমার : আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর : আমিও যাব না মনে করছ নাকি?

মহারাজ : তবে ঈশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজধরের শিবির। রাজধর ও ধুরন্ধর

ধুরন্ধর : তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তফাতে থাকবে নাকি?

রাজধর : হ্যাঁ—ঈশা খাঁর কাছে আমি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলুম।

ধুরন্ধর : সে তো আমি জানি; আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়ে গেল।

রাজধর : কিরকম ?

ধুরন্ধর : প্রথমেই তো ইন্দ্রকুমার অট্টহাস্য করে উঠলেন। তিনি বললেন, রাজধরের যুদ্ধ প্রণালীটাই ওইরকম—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে থেকেই তিনি যুদ্ধ করতে ভালোবাসেন।

রাজধর : সে কথা ঠিক। ক্ষেত্রে থেকে যুদ্ধ করে মজুররা—দূরে থেকে যে যুদ্ধ করতে পারে সেই যোদ্ধা। ইশা খাঁ কী বললেন ?

ধুরন্ধর : তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস কিরকম সে তো তুমি জানই—তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তা হলেও তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে। তাই ইশা খাঁ বললেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধর তফাতে থাকতে চান সেটা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়, কিন্তু পাঁচ হাজার সৈন্য সঙ্গে রাখতে চান সেইটে আমার ভালো ঠেকছে না।

রাজধর : যুবরাজ কিছু বললেন না ?

ধুরন্ধর : যুবরাজ কাউকে যে সন্দেহ করবেন সে পরিমাণ বুদ্ধি ভগবান তাঁকে দেন নি—এমন কি, তুমি যে তুমি, তোমার উপরেও তাঁর সন্দেহ হয় না।

রাজধর : দেখো ধুরন্ধর, দাদার কথা তুমি অমন করে বোলো না।

ধুরন্ধর : ওঃ, ঐ জায়গাটা তোমার একটু নরম আছে, সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যা হোক, তিনি বললেন, না না, রাজধরের প্রতি তোমরা অন্যায় অবিচার করছ, তাঁর প্রস্তাবটা তো আমার ভালোই ঠেকছে। যুদ্ধে যদি সংকট উপস্থিত হয় তা হলে তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। যুবরাজের অনুরোধেই তো ইশা খাঁ তোমার প্রস্তাবে রাজি হলেন, নইলে তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিল না। যাই হোক—কিন্তু আমি তোমার আলাদা থাকবার মতলব ভালো বুঝতে পারছি না।

রাজধর : ওঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে যুদ্ধ করে আমার লাভ কী—জিত হলে সে জিতকে কেউ আমার জিত বলবে না তো।

ধুরন্ধর : তবু ভুলেও কেউ তোমার নাম করতে পারে। কিন্তু তফাতে বসে থাকলে যুদ্ধে জয় হলেও তোমার অপযশ, হারলে তো কথাই নেই।

রাজধর : আমার এই পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়েই আমি যুদ্ধে জিতব এবং আমি একলাই জিতব।

[দূতের প্রবেশ]

রাজধর : কী রে, যুদ্ধের খবর কী ?

দূত : আজ্ঞে, লড়াই তো সমস্তদিন ধরেই চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এঁরা শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেন নি। সূর্য অস্ত যাবার আর তো বেশি দেরি নেই—অন্ধকার হয়ে এলে বোধ হয় যুদ্ধ আজকের মতো বন্ধ রাখতে হবে।

[দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ]

রাজধর : কে তুমি ?

দ্বিতীয় দূত : আজ্ঞে আমি ব্যোমকেশ। যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সেও প্রায় দুই প্রহর হয়ে গেল। আপনার যেখানে সৈন্য নিয়ে থাকবার কথা ছিল সেখানে আপনার কোনো চিহ্ন না পেয়ে বহু সন্ধানে এখানে এসেছি।

রাজধর : যুবরাজের আদেশ কী ?

দূত : শত্রুসৈন্যের সংখ্যা আমরা যে-রকম অনুমান করেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধ খুব কঠিন হয়ে এসেছে। কুমার ইন্দ্রকুমার তাঁর অশ্বারোহীদল নিয়ে শত্রুসৈন্যের উত্তর দিক আক্রমণ করেছিলেন, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই তিনি সে দিক থেকে শত্রুসৈন্যকে একেবারে নদীর কিনারা পর্যন্ত হঠিয়ে আনতে পারতেন।

রাজধর : সত্যি নাকি ! সময় পেলে কী করতে পারতেন সে কথা কল্পনা করে বিশেষ লাভ দেখি নে—কিন্তু সময় পান নি বলেই বোধ হচ্ছে।

দূত : শত্রুসৈন্যকে যখন প্রায় টলিয়ে এনেছেন এমন সময় খবর পেলেন যে, যুবরাজ সংকটে পড়েছেন. শত্রু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। ইশা খাঁ তখন অন্য দিকে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি খবর পেয়ে বললেন,

যুবরাজকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি, আমাকে যুদ্ধে জিততে হবে ; আমি এখান থেকে নড়তে গেলেই শত্রুরা সুবিধা পাবে।

রাজধর : দাদা কি তবে—

দূত : না, তাঁর কোনো বিপদ এখনো ঘটে নি। ইন্দ্রকুমার সৈন্য নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এই গোলমালে যুদ্ধে আমাদের অসুবিধা ঘটল। আপনাকে সন্ধান করবার জন্যে নানা দিকে দূত গিয়েছে— আপনার সাহায্য না হলে বিপদ ঘটতেও পারে, অতএব আপনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

রাজধর : না, কিছুমাত্র বিলম্ব করব না। যাও, তুমি বিশ্রাম করো গে যাও—আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

[দূতের প্রস্থান]

ধুরন্ধর : তুমি যাচ্ছ নাকি ?

রাজধর : যাচ্ছি বটে, কিন্তু ও দিকে নয়, অন্য দিকে।

ধুরন্ধর : বাড়ির দিকে ?

রাজধর : তুমিও কি ইশা খাঁর কাছ থেকে বিদ্রূপ অভ্যেস করেছ ! বীরত্ব যাঁর খুশি তিনি দেখান, কিন্তু যুদ্ধে জয় করে যদি কেউ বাড়ি ফেরে তো সে রাজধর। ধুরন্ধর, যাও তুমি—দেখো গে আমার শিবিরে কোথাও যেন কেউ আগুন না জ্বালে, একটি প্রদীপও যেন না জ্বলতে পায়।

ধুরন্ধর : আচ্ছা, আমি সকলকে সতর্ক করে দিচ্ছি—কিন্তু, কী তোমার অভিপ্রায় খুলেই বলো না। তুমি যদি আমাকে আর আমি যদি তোমাকে সন্দেহ করি তা হলে পৃথিবীতে আমাদের দুটির তো কোথাও ভর দেবার জায়গা থাকবে না।

রাজধর : আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি সৈন্য নিয়ে গোপনে নদী পার হয়ে যাব। হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে হবে।

ধুরন্ধর : এখানে কোথায় পার হবে, ঘাট তো নেই।

রাজধর : পথ ঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক করে রেখেছি। সূর্য তো অস্ত গেল। আজ আড়াই প্রহর রাত্রে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে, অতএব আর বড়ো বেশি দেরি নেই—তুমি যাও, প্রস্তুত হও গে। আর একটি কাজ করো—যুবরাজের দূত যেন ফিরে যেতে না পারে, তাকে বন্দী করে রাখো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইশা খাঁর শিবির। ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ

ইন্দ্রকুমার : সেনাপতি-সাহেব, আপনি দাদার উপর রাগ করবেন না! আজ রাত্রে সৈন্যরা বিশ্রাম করুক, কাল আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করব।

ইশা খাঁ : দেখো ইন্দ্রকুমার, আগুন যত শীঘ্র নেবানো যায় ততই মঙ্গল—তাকে সময় দিলে কিসের থেকে কী ঘটে কিছুই বলা যায় না। আজই আমরা জিতে আসতুম—কেবল তোমার দাদা নিতান্ত নির্বোধের মতো শত্রুদের মাঝখানে নিজেকে খামকা জড়িয়ে বসলেন, আমাদের সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল।

ইন্দ্রকুমার : নির্বোধের মতো কেন বলছ খাঁ সাহেব, বলো বীরের মতো। তিনি সামান্য কয়জন সৈন্য নিয়ে—

ইশা খাঁ : যেখানে গিয়ে পড়েছিলেন সেখানে কেবল নির্বোধই যেতে পারে—

ইন্দ্রকুমার : (উত্তেজিত স্বরে) না, সেখানে বীর না হলে কেউ প্রবেশ করার সাহস করতে পারে না।

ইশা খাঁ : আচ্ছা বাবা, তোমার কথা মানছি। কিন্তু শুধু বীর নয়, নির্বোধ বীর না হলে সে দিকে কেউ যেত না!

ইন্দ্রকুমার : কিন্তু তাতে তোমার লড়াইয়ের তো কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

ইশা খাঁ : খুব ব্যাঘাত হয়েছিল। আমার সৈন্যরা খবর পেয়ে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল, তাদের কি আর লড়াইয়ে মন ছিল? আমাদের সৈন্যের মধ্যে একজনও নেই যুবরাজের বিপদের খবর শুনে যে স্থির থাকতে পারে।

ইন্দ্রকুমার : কিন্তু সেনাপতি-সাহেব, আমাদের রাজধরের খবর কী?

ইশা খাঁ : আমি চারদিকেই দূত পাঠিয়েছিলুম, একজন ছাড়া সব দূতই ফিরে এসেছে—কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার : হা হা হা হা, সে নিশ্চয় পালিয়েছে।

ইশা খাঁ : হাসির কথা নয় বাবা।

ইন্দ্রকুমার : তা কী করব সেনাপতি-সাহেব, আমি খুশি হয়েছি। আমরা যুদ্ধ করে মরতুম আর ও যে আমাদের খ্যাতিতে ভাগ বসাত, সে আমার কিছুতে সহ্য হত না; তার চেয়ে ও ভেগে গেছে, সে ভালোই হয়েছে। এবারকার অস্ত্রপরীক্ষায় তো ফাঁকি চলবে না।

ইশা খাঁ : কিন্তু, সেবার কী হয়েছিল তুমি আমার কাছে বল নি।

ইন্দ্রকুমার : সে বলবার কথা না, খাঁ-সাহেব—সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, সেবার আমি হেরেছিলুম।

ইশা খাঁ : তীর ছুঁড়ে হারো নি বাবা, রাগ করে হেরেছিলে।



তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজের শিবির । আরাকান-রাজ ও রাজধর

আরাকান-রাজ : দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই ।

রাজধর : কেন লাভ নেই, রাজন্ ? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সব চেয়ে বড়ো লাভ ।

আরাকান-রাজ : তাতে যুদ্ধের অবসান হবে না। আমার ভাই হামচু রয়েছে, সৈন্যেরা তাকেই রাজা করবে, যুদ্ধ যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

রাজধর : আপনাকে মুক্তিই দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনামূল্যে দেওয়া চলবে না।

আরাকান-রাজ : সে আমি জানি—মূল্য দিতে হবে। আমি আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে রাজি আছি।

রাজধর : শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না, মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।

আরাকান-রাজ : আপনাকে পাঁচশত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।

রাজধর : সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই—মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।

আরাকান-রাজ : তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া সহজ ছিল।

রাজধর : প্রাণ দিলেও মুকুটটি তো বাঁচাতে পারবেন না, মাঝের থেকে প্রাণটাই বৃথা যাবে।

আরাকান-রাজ : তবে মুকুট নিন, কিন্তু এই মুকুটের সঙ্গে আরাকানের চিরস্থায়ী শত্রুতা আপনি ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুকুট যতদিন-না আবার ফিরে পাব ততদিন আমার রাজবংশে শান্তি থাকবে না।

রাজধর : এই তো রাজার মতো কথা। আমরাও তো শান্তি চাই নে মহারাজ, আমরা ক্ষত্রিয়। আর একটি কর্তব্য বাকি আছে। শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করে এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠিয়ে দিন, ওপারে এতক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ হচ্ছে।

আরাকান-রাজ : এখনই আমার আদেশ নিয়ে দূত যাবে।

রাজধর : তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

রণক্ষেত্র। যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার

যুবরাজ : আজকের যুদ্ধের গতিকটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সৈন্যেরা কালকের ব্যাপারে আজও নিরুৎসাহ হয়ে রয়েছে—ওরা যেন ভালো করে লড়ছে না। ইশা খাঁ কোন্ দিকে?

ইন্দ্রকুমার : ঐ যে পূর্বকোণে তাঁর নিশান দেখা যাচ্ছে।

যুবরাজ : ভাই, তুমি কেন আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। তোমার বোধ হয় ঐ উত্তরের দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

ইন্দ্রকুমার : না, আমার এই জায়গাই ভালো।

যুবরাজ : ইন্দ্রকুমার, তুমি তোমার দাদাকে আজ নির্বুদ্ধিতার থেকে বাঁচাবার জন্যে সর্তক হয়ে কাছে কাছে ফিরছ! খাঁ-সাহেব যে আবার কোনো সুযোগে আমার বুদ্ধির দোষ ধরবেন এটা তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু ভাই, আমারও নির্বুদ্ধিতার সীমা আছে— আমি আজ বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। ঐ দেখো, চেয়ে দেখো, আমার কিন্তু ভালো বোধ হচ্ছে না। ঐ দেখো—ঐ পাশে আমাদের সৈন্যেরা যেন টলেছে, এখনই পালাতে আরম্ভ করবে— তুমি না হলে কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না। ইন্দ্রকুমার, দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নেই। এ কী! এ কী! এ কী!

ইন্দ্রকুমার : তাই তো, এ কী! শত্রুসৈন্যেরা হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করলে যেন! ঐ-যে সন্ধির নিশান উড়িয়েছে। ওদের তো পরাজয়ের কোনো লক্ষণ ছিল না, তবে কেন এমন ঘটল? আমার তো মনে হচ্ছিল আজকের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরাই টল্‌মল্ করছে।

[দূতের প্রবেশ]

দূত : যুবরাজ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়েছে।

যুবরাজ : সে তো দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ কী ?

দূত : কারণ এখনো জানতে পারি নি, কিন্তু শুনতে পেয়েছি, আরাকান-রাজ আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে করবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

যুবরাজ : সুসংবাদ। আমার কেবল মনে একটি বেদনা বাজছে।

ইন্দ্রকুমার : কিসের বেদনা, দাদা ?

যুবরাজ : রাজধর কেন সৈন্য নিয়ে চলে গেল। সে যদি থাকত তা হলে কী আনন্দের সঙ্গে আমরা তিন ভাই জয়োৎসব করতে পারতুম। আজকের আমাদের জয়গৌরবের মধ্যে এই একটি মস্ত অভাব রয়ে গেল—রাজধর যুদ্ধে যোগ না দিয়ে আমাকে বড়ো দুঃখ দিয়েছে।

ইন্দ্রকুমার : জয়ের ভাগ না নিয়েই সে যদি পালিয়ে থাকে তাতে এমন কী ক্ষতি হয়েছে দাদা ?

যুবরাজ : না ভাই, আমরা তিন ভাই একত্রে বেরিয়েছি, বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা ভাগ করে ভোগ না করতে পারলে আমার তো মনে দুঃখ থেকে যাবে। রাজধর যদি মাথা হেঁট করে বাড়ি ফেরে, আমাদের সৌভাগ্যে যদি তার মুখ বিমর্ষ হয়, তা হলে এই কীর্তি আমাকে কিছুমাত্র সুখ দেবে না।— ঐ যে ঘোড়া ছুটিয়ে সেনাপতি-সাহেব আসছেন।

[ইশা খাঁর প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার : খাঁ-সাহেব, শত্রুসৈন্য হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে দিলে কেন তার কোনো খবর পেয়েছ ?

ইশা খাঁ : পেয়েছি বৈকি ! রাজধর আরাকান-রাজকে বন্দী করেছে।

ইন্দ্রকুমার : রাজধর ! মিথ্যা কথা !

ইশা খাঁ : যা মিথ্যা হওয়া উচিত ছিল এক-এক সময় তাও সত্য হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লার দূতেরা এক-এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উল্‌টো করে দিয়ে যায়।

ইন্দ্রকুমার : শয়তানও কি রাজধরকে জিতিয়ে দিতে পারে !

ঈশা খাঁ : একবার তো জিতিয়েছিল সেই অস্ত্রপরীক্ষার সময়—এবারও সেই শয়তান জিতিয়েছে।

যুবরাজ : সেনাপতি-সাহেব, তুমি রাজধরের উপর রাগ কোরো না ! সে যদি জিতে থাকে তাতে তো আমাদেরই জিত। কখন সে যুদ্ধ করলে কখন বা বন্দী করলে, আমরা তো জানতে পারি নি।

ঈশা খাঁ : কাল সন্ধ্যার পরে আমরা যখন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে ফিরে এলেম তখন সে অন্ধকারে গোপনে নদী পার হয়ে হঠাৎ আরাকান-রাজের শিবির আক্রমণ করে তাকে বন্দী করেছে। আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি তাকে যেখানে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলুম সেখানে সে ছিলই না। আমি সেনাপতি, আমার আদেশ সে মান্যই করে নি।

ইন্দ্রকুমার : অসহ্য। এ জন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ঈশা খাঁ : শুধু তাই ! যুবরাজ উপস্থিত থাকতে সে কিনা নিজের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র রচনা করেছে।

ইন্দ্রকুমার : এর শাস্তি না দিলে অন্যায় হবে।

ঈশা খাঁ : তোমার দাদাকে এই সহজ কথাটি বুঝিয়ে দাও দেখি।

[রাজধরের প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার : রাজধর ! তুমি কাপুরুষতা প্রকাশ করেছ।

রাজধর : তোমার মতো যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পুরুষকার প্রকাশ করতে আমি এত দূরে আসি নি—আমি যুদ্ধে জয় করতে এসেছিলুম।

ইন্দ্রকুমার : তুমি যুদ্ধ করেছ ! এবং জয় করেছ ! জয়লক্ষ্মীর মুখ যে লজ্জায় লাল করে তুলেছ।

রাজধর : তা হতে পারে, সেটা প্রণয়ের লজ্জা। কিন্তু তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন তার সাক্ষী এই।

ইন্দ্রকুমার : এ মুকুট কার ?

রাজধর : এ মুকুট আমার। এ আমার জয়ের পুরস্কার।

ইন্দ্রকুমার : যুদ্ধ থেকে পালিয়েছ তুমি—তুমি পুরস্কার পাবে কিসের? এ মুকুট যুবরাজ পরবেন।

রাজধর : আমি জিতে এনেছি, আমিই পরব।

যুবরাজ : রাজধর ঠিক কথাই বলছেন। ওঁর জয়ের ধন তো উনিই পরবেন।

ইশা খাঁ : সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করে উনি অন্ধকারে শৃগালবৃত্তি অবলম্বন করলেন—আর উনি পরবেন মুকুট! ভাঙা হাঁড়ির কানা পরে যদি দেশে যান তবেই ওঁকে সাজবে।

রাজধর : আমি যদি না থাকতুম ভাঙা হাঁড়ির কানা তোমাদের পরতে হত। এতক্ষণ থাকতে কোথায়?

ইন্দ্রকুমার : যেখানেই থাকি তোমার মতো পালিয়ে থাকতুম না।

যুবরাজ : ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলছ ভাই। সত্য বলতে কী, রাজধর না থাকলে আজ আমাদের বিপদ হত।

ইন্দ্রকুমার : কিচ্ছু বিপদ হত না। রাজধর সৈন্য লুকিয়ে রেখেই আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। রাজধর না থাকলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করে আনতুম। রাজধর চুরি করে এনেছে। দাদা, এ মুকুট এনে আমি তোমাকেই পরাতুম, নিজে পরতুম না।

যুবরাজ : (রাজধরের প্রতি) ভাই, তুমিই আজ জিতেছ। তুমি না থাকলে অল্প সৈন্য নিয়ে আমাদের কী বিপদ হত বলা যায় না। এ মুকুট আমি তোমাকেই পরিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার : (রুদ্ধকণ্ঠে) রাজধর ক্ষাত্রধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলে তোমার কাছ থেকে আজ পুরস্কার পেলে—আর আমি যে প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলুম, তোমার মুখ থেকে একটা প্রশংসার কথাও শুনতে পেলুম না। এমন কথা তোমার মুখ থেকে আজ শুনতে হল যে, রাজধর না থাকলে কেউ তোমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারত না। কেন দাদা, আমি কি প্রত্যুষ থেকে আর সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করি নি? আমি কি রণক্ষেত্র ছেড়ে



পালিয়েছিলুম ? আমি কি শত্রুসৈন্যের বেষ্টন ছিন্ন করে তোমার সাহায্যের জন্যে আসি নি ? কী দেখে তুমি বললে, তোমার স্নেহের রাজধর ছাড়া কেউ তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত না।

যুবরাজ : ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলছি নে।

ইন্দ্রকুমার : থাক্ দাদা, থাক্। আর কিছুই বলতে হবে না রাজধরের মতো এমন অসাধারণ বীরকে যখন তুমি সহায় পেয়েছ তখন আমার আর প্রয়োজন নেই—আমি চললেম।

যুবরাজ : ভাই, আবার ! আবার তুমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছ !

ইন্দ্রকুমার : যেখানে আমার প্রয়োজন নেই সেখানে আমার পক্ষে থাকাই অপমান।

[প্রস্থান]

ইশা খাঁ : যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাউকে দেবার অধিকার নেই। আমি সেনাপতি, আমি যাকে দেব এ তারই হবে।

[রাজধরের মাথা হইতে মুকুট লইয়া যুবরাজকে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন]

যুবরাজ : (সরিয়া গিয়া) না, এ মুকুট আমি নিতে পারি নে।

ইশা খাঁ : তবে থাক্। এ মুকুট কেউ পাবে না। এ কর্ণফুলির জলে যাক (মুকুট নিক্ষেপ) রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।

রাজধর : দাদা, তুমি সাক্ষী রইলে। এ আমি ভুলব না।

যুবরাজ : এইটেই কি সকলের চেয়ে মনে রাখবার কথা? মুকুটটা যদি জলে গিয়ে থাকে তবে ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও যাক। তোমারও যা ভোলবার ভোলো, আমাদেরও যা ভোলবার ভুলে যাই। দেখি ইন্দ্রকুমার সত্যই রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে গেল কি না।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির। রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর : ধুরন্ধর, আমার মুকুট যেখানে গিয়েছে আমাদের যুদ্ধজয়কেও সেই কর্ণফুলির জলে জলাঞ্জলি দেব।

ধুরন্ধর : আবার হারবে নাকি?

রাজধর : হাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধুলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না। আমার হাতের জিতকে তিনি গ্রহণ করবেন না। দেখি, এবার নিজে তিনি কেমন জিততে পারেন।

ধুরন্ধর : অত বেশি নিশ্চিন্ত হোয়ো না—দৈবাৎ জিতে যেতেও পারে। সত্যি কথায় রাগ করলে চলবে না, যুদ্ধবিদ্যাটা ইন্দ্রকুমার একটু শিখেছে!

রাজধর : আচ্ছা, সে-সব তর্ক পরে হবে। এখন তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আরাকান-রাজ সৈন্য নিয়ে কাল প্রাতেই যাত্রা করবেন। কথা আছে, যতদিন না তিনি চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে যাবেন ততদিন তাঁর সেনাপতিরা আমার শিবিরে বন্দী থাকবেন। তিনি শিবির তোলবার পূর্বেই আজ রাত্রে গোপনে তাঁর কাছে তুমি আমার এই চিঠিখানি নিয়ে যাবে।

ধুরন্ধর : চিঠিতে কী আছে সেটা তো আমার জানা ভালো। কেননা, যদি দুটো-একটা কথা বলবার দরকার হয় তা হলে বলে কাজটা চুকিয়ে আসতে পারব।

রাজধর : আমি লিখেছি—আমি অপমানিত হয়েছি, এইজন্য আমার ভাইদের কাছ থেকে আমি অবসর নিলুম। আমার পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি গৃহে ফেরবার ছলে দূরে চলে যাব। ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অভিমান করে চলে গেছে। সৈন্যেরাও যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে জেনে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে—এই অবকাশে যদি আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ করেন তা হলে ত্রিপুরার সৈন্যদের নিশ্চয় হার হবে।

ধুরন্ধর : হার তো হবে। তার পরে? তুমি সুদ্ধ শেষে হায় হায় করে মরবে না তো? আগুন যদি লাগাতে হয় তো নিজের ঘরের চালটা সামলে লাগাতে হবে।

রাজধর : আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যে আর কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। তুমি প্রস্তুত হও গে—দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে। আমার সৈন্যরা যদি কোনোমতে সন্দেহ করে তা হলে সমস্তই পণ্ড হবে।

ধুরন্ধর : দেখো রাজধর, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্যেও আর কারো বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণক্ষেত্র। ঈশা খাঁ ও যুবরাজ।

ঈশা খাঁ : যুবরাজ, আল্লাকে স্মরণ করো। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

যুবরাজ : শক্তটা কিসের, খাঁ-সাহেব। ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়, সবই সহজ।

ঈশা খাঁ : মহারাজ আমার হাতে তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ হচ্ছে; নইলে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহশয্যায় নিদ্রা। যুবরাজ, তুমি পালাবার চেষ্টা করো—যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

যুবরাজ : তুমি আমাদের অস্ত্রগুরু, তোমার মুখে এ উপদেশ সাজে না। তা ছাড়া পথই বা কোথায়? আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ হয়েছে পালাবার তেমন নয়।

ঈশা খাঁ : কিন্তু বাবা, মনের মধ্যে একটা আগুন জ্বলছে। ইন্দ্রকুমার যে অভিমান করে দূরে চলে গেল, তার এই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।

যুবরাজ : যদি বেঁচে না থাক সেনাপতি, তা হলে তার শাস্তি আরো ঢের বেশি হবে। সে যে তোমাকে পিতার মতো জানে।

ঈশা খাঁ : আল্লা! সে কথা সত্য। বাবা, আজ বুঝছি আমার সময় হবে না। কিন্তু যদি তোমার সুযোগ হয় তবে তাকে বোলো, যদি ঈশা খাঁ বেঁচে থাকত তবে তাকে শাস্তি দিত কিন্তু মরবার আগে তাকে ক্ষমা করে মরেছে। ব্যস্, আর সময় নেই—চললুম বাবা! এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। আল্লার হাতে দিয়ে গেলুম, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

যুবরাজ : খাঁ-সাহেব, কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

ইশা খাঁ : বাবা, জন্মকাল থেকে তোমাকে দেখছি, কোনোদিন কোনো অপরাধ তুমি জমতে দাও নি, হাতে হাতে সমস্তই নিকাশ করে দিয়েছ—আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখ নি। তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তাঁর স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র। সৈন্যদল

প্রথম সৈনিক : এ কি সত্যি?

দ্বিতীয় সৈনিক : কী জানি ভাই, শুনছি তো।

প্রথম : তবে তো সর্বনাশ হবে।

[দ্রুত প্রস্থান। দ্বিতীয় দলের প্রবেশ]

প্রথম : কে বললে রে, কে বললে?

দ্বিতীয় : আমাদের উমেশ বললে।

তৃতীয় : কী জানি ভাই, শুনে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল, ভালো করে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

দ্বিতীয় : চল, ভালো করে খোঁজ করে আসি গে।

[প্রস্থান। আর এক দলের প্রবেশ]

চতুর্থ : ওরে সর্বনাশ হয়ে গেল যে রে, কুমার ইন্দ্রকুমারকে কি কেউ খবর দিতে ছোটে নি ?

তৃতীয় : অনেকক্ষণ গিয়েছে—আরাকানের ফৌজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে আক্রমণ করতেই, তখনই লোক গেছে—তাঁকে খুঁজে পেলে তো হয়।

দ্বিতীয় : কুমার রাজধর কি এখনো খবর পান নি ?

চতুর্থ : তিনি কোথায় আছেন খবরই পাওয়া গেল না—বোধ করি ত্রিপুরার দিকে চলে গেছেন। যুবরাজের সংবাদ জানতে পেলে এতক্ষণে তিনিও দৌড়ে ছুটে আসতেন।

প্রথম : আমরা কোন্ মুখে দেশে ফিরব !

তৃতীয় : ফিরব কেন, মরা যাক।

চতুর্থ : যুদ্ধই ফুরিয়ে গেল তো মরব কী করে ?

[অপর ব্যক্তির প্রবেশ]

অপর : ওরে, করছিস কী ! সর্বনাশ হল যে—একবার খোঁজ করবি চল্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র। ইন্দ্রকুমার ও সৈনিক।

ইন্দ্রকুমার : কোথায়—কোথায়—কোথায় ? ওরে, দাদা কোথায় ?

সৈনিক : তাঁকেই তো খুঁজছি, প্রভু।

ইন্দ্রকুমার : আর, ইশা খাঁ ?

সৈনিক : আজ বেলা চার প্রহরের সময় যুবরাজ স্বহস্তে ইশা খাঁর

কবরে মাটি দিয়েছেন—সেই মাটিতে তাঁর নিজেরও রক্ত তখন মিশছিল।

ইন্দ্রকুমার : ধিক্ ধিক্ ধিক্, ইন্দ্রকুমার! ধিক্ তোকে! ধিক্ তোর চণ্ডাল রাগকে! দাদা! দাদা! এই নরাধমকে একবার মাফ চাইতেও সময় দেবে না? (উচ্চৈঃস্বরে) দাদা! সাড়া দাও! কেবল এক মুহূর্তের জন্যেও সাড়া দাও। ওরে, আর কেউ নেই নাকি? যে যেখানে আছিস সকলে মিলে তাঁকে খোঁজ—আজ আমার দাদাকে চাইই যে!

[দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ]

দ্বিতীয় : এই দিকে চলুন কুমার। তাঁর দেখা পেয়েছি।

ইন্দ্রকুমার : কোথায়? কোথায়?

দ্বিতীয় : কর্ণফুলির তীরে অর্জুনগাছের তলায়।

ইন্দ্রকুমার : সত্য করে বল, তিনি কি—

দ্বিতীয় : তিনি বেঁচে আছেন—তোমার জন্যই অপেক্ষা করে রয়েছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণফুলির তীর। তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে

যুবরাজ : ওরে, সরিয়ে দে রে, একটু সরিয়ে দে! গাছের ডালগুলো একটু সরিয়ে দে, আজ আকাশের চাঁদকে একটু দেখে নিই। কেউ নেই। এ কি গাছেরই ছায়া, না আমার চোখের উপরে ছায়া পড়ে আসছে। এখনো কর্ণফুলির স্রোতের শব্দ তো শুনতে পাচ্ছি। এই শব্দটিতেই কি পৃথিবীর শেষ বিদায়সম্ভাষণ শুনব? ইন্দ্রকুমার! ভাই ইন্দ্রকুমার! এখনো তোমার রাগ গেল না!

[ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার : দাদা ! দাদা !

যুবরাজ : আঃ, বাঁচলুম, ভাই। তুমি আসবে জেনেই এত দেরি করেও বেঁচেছিলুম। তুমি অভিমান করে গিয়েছিলে বলেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এবার তবে ঘুমোই—মা কোল পেতেছেন।

ইন্দ্রকুমার : দাদা, মার্জনা করলে কি !

যুবরাজ : সমস্তই, সমস্তই ! এখানকার যা-কিছু ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখি নি। কেবল একটি দুঃখ রইল, মহারাজের কাছে খবর পাঠাতে হবে, আমার পরাজয় হয়েছে।

ইন্দ্রকুমার : পরাজয় তোমার হয় নি দাদা—আমারই পরাজয় হয়েছে।

[সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক : কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার : কখনো না। কিছুতেই না।

যুবরাজ : ডাকো, ডাকো, তাকে ডাকো।

ইন্দ্রকুমার : (রাগিয়া) দাদা রাজধরকে—

যুবরাজ : আবার, ভাই ! আবার !

ইন্দ্রকুমার : না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ নেই।

[রাজধরের প্রবেশ ও প্রণাম]

রাজধর : আমি নরাধম। এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম। এ তোমারই।

যুবরাজ : আমার সময় নেই ! ইন্দ্রকুমারকে দাও, ভাই !

রাজধর : দাদার আদেশ মাথায় করলেম ! এ মুকুট তুমি নাও।

ইন্দ্রকুমার : আমি পরাজিত—এ মুকুট আমার নয়। এ আমি তোমাকেই পরিয়ে দিলুম—দাদা !

যবনিকা



লক্ষ্মণের শক্তিশেল

সুকুমার রায়

নাটকের পাত্রগণ

রাম
লক্ষ্মণ
জাম্বুবান
সুগ্রীব
হনুমান
বানরগণ

রাবণ
বিভীষণ
দূত
যম
যমদূতদ্বয়
সভাসদগণ

প্রথম দৃশ্য

রামের শিবির

রাম : কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে-চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ !

জাম্বুবান : তবে হয়ত রাবণ ব্যাটা সত্যি-সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে : হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম : আমি হনুমানকে বললুম, যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হল না—সে একেবারে মরে গেছে।

সকলে : বাঃ বাঃ !—একদম মরে গেছে—ব্যাস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর ! (বাহিরে গোলমাল) ঐ দেখ রাবণের রথ দে'া যাচ্ছে—দেখেছিস ? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে : সে কি ! রাবণ ব্যাটা তবু মরে নি—ব্যাটার জান তো খুব কড়া !

জাম্বুবান : এই হনুমান ব্যাটাই তো সব মাটি কললে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছে—'একেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ : চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

[দূতের প্রবেশ]

সকলে : কি হে, খবর কি ?

দূত : আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ : ব্যাস ! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি !

জাম্বুবান : এইমাত্র আসছ ? তোপ ফেলতে হবে ?

রাম : আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল।

দূত : আজ্ঞে, আমি ছান-টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন ? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে : বাজে বকিস নে—কাজের কথা বল।

দূত : হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যারা—

সকলে : মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে !

জাম্বুবান : ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল !

সুগ্রীব : ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিকরূপে আদ্যোপান্ত পর্যায় পরম্পরা সব বলবি কি না ?

রাম : তারপরে কি হল শুনি—ততঃ কিম্ ?

দূত : [গান]
আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে : ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

দূত :
শঙ্খ হুলাহুলি শানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝঙ্কার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে : ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

দূত :
লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে !

সকলে : ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

দূত :
বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে : ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

দূত : তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে : ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ?

দূত : আজি দুর্দিনেতে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবে আজি অক্কা।

জাম্বুবান : চোপরাও বেয়াদব ! মুখ সামলে কথা বলিস।

রাম : তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে ?

দূত : আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে : হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা !

দূত : আজ্ঞে, একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টায় হতে পারে।

জাম্বুবান : তুমি কি করে আসছিলে ? হামাগুড়ি দিয়ে ?

রাম : কোন্‌দিকে আসছিল, বল তো ?

দূত : আজ্ঞে, তা তো জিগ্‌গেস করি নি !

সকলে : ব্যাটা ! তুমি আছ কোন্ কর্মে ?

রাম : তাড়াতাড়ি আসছিল, না আস্তে আস্তে ?

দূত : আজ্ঞে তাড়াতাড়ি—আস্তে, আস্তে। আজ্ঞে, সেটা ঠিক ঠাওর করে দেখি নি !

সকলে : এটা কোথাকার অপদার্থ রে ? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ : জাম্বুবানের প্রতি —মন্ত্রীমশাই ! একটা কথা শুনুন ! কানে-কানে বলব—

জাম্বুবান : উঃ-দূৎ ! বনমানুষ কোথাকার ! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ ! শুনব না—

দূত : হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ

বিভীষণ : বেটা, হাসছিস কেন রে বেয়াদব ?

[বিভীষণের দূতকে প্রহার ও অর্ধচন্দ্র]

সুগ্রীব : ওরে, কে কোথা আছিস ? আমার গদাটা নিয়ে আয় তো।

সকলে : কেন ? গদা কেন ?

সুগ্রীব : রাবণকে ঠ্যাঙাব।

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান : রাবণ বোধ হয় আসছে!

সকলে : যা—যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসী সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব : চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে—

[সকলের উত্থান ও প্রস্থান]

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল। সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব : (ভয়ে ভয়ে)—কেউ নেই তো?

[সুগ্রীবের পদচারণা। বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ : দেখ, হাঁটছে, দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—দূৎ! যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট।

[বিভীষণের হাঁটার নমুনার প্রদর্শন]

সুগ্রীব : রেখে দাও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ওরকম হাড়গিলের মতো করে হাঁটে না।

বিভীষণ : তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ তো!

সুগ্রীব : মানুষ বললে কেন হে? খামখা গাল দিচ্ছ কেন?

[নেপথ্যে জাম্বুবানের কণ্ঠস্বর : 'ওরে, তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।']



বিভীষণ ও সুগ্রীব : অ্যাঁ—কি !

(গান) যদি রাবণের ঘুষি লাগে গায়—

তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম-রে যা-বি—

ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা

তা না হলে মরে যাবি—

লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ : ওরে, আমার মনে পড়ছে—একটা বড্ড জরুরী কাজ বাকি আছে—সেটা চট করে সেরে আসছি।

[বিভীষণের প্রস্থান]

সুগ্রীব : এইবার বোধ হয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছু হয়ে যাবে —ইসপার নয় উসপার—

[রাবণের প্রবেশ]

সুগ্রীব : (গান) তবে রে রাবণ ব্যাটা

তোর মুখে মারব ঝাঁটা

তোরে এখন রাখবে কেটা

এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল।

(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত

ভাঙ্গিয়া করিব অন্ত

তোর এখনি হবে প্রাণান্ত

আয় রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্ ॥

রাবণ : ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।

যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব ॥

ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।

আয় তবে আয় ষষ্টির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া ॥

সুগ্রীব : রেখে দে তোর গলাবাজি

ওরে ব্যাটা ছুঁচো বাজি

অন্তিম সময় আজি

ইষ্টদেবে কর রে নমস্কার।
তুই রে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার ॥

রাবণ : ওরে বেয়াদব কহিলে যে-সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবি রে নির্বোধ
পাঠাব শমন সদন ॥

[সুগ্রীবকে রাবণের প্রহার]

সুগ্রীব : ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে !
কাজ নেই রে খোঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে ?

[সুগ্রীবের পলায়ন]

রাবণ : ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি ? শেম্ ! শেম্ !

[লক্ষ্মণের প্রবেশ, রাবণের গান]

রাবণ : আমার সহিত লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত—
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত।
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি ?

কোথায় লাগে-বা   কুরো পাট্‌কিন্‌
কোথায় রোজেদ্‌ ভেনিস্কি ?
এই যে অস্ত্র   দেখিছ পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে   যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে   যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাব শক্তি   রাখিব কীর্তি
দলে বলে সবে নাশিয়া ॥

[লক্ষ্মণের লাঠি চালনা]

লক্ষ্মণ : হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর হর হর হর—মার, মার, মার, মার, মার—কাট কাট কাট কাট কাট কাট—হা হতোস্মি !

[লক্ষ্মণের পতন ও মূর্চ্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন। হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান : অ্যাঁ ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি !

[রাবণের পলায়ন বানরগণের প্রবেশ ও গান]

বানরগণ :   অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো—
ষষ্টির বাড়ি   সুগ্রীবে মারি
কল্‌লে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো ॥
(আহা)   অতি মহাতেজা   সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো
অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো ॥
(আরো)   গদা ঘুরাইয়া   দিল উড়াইয়া
লক্ষ্মণেরি ধড়া চুড়ো—
অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো ॥

(ওরে)　লক্ষ্মণে মেরে　　বানর দলেরে
কল্‌লে ব্যাটা তাড়াহুড়ো
অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো ॥
(ব্যাটা)　বুদ্ধি বিপুল　　যুদ্ধে নিপুণ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো,
অবাক কল্‌লে রাবণ বুড়ো ॥

[লক্ষ্মণকে লইয়া বানরগণের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্রের শিবির রাম, বিভীষণ ও জাম্বুবান।

রাম : কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধ হয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ : তা হবে!

[খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজবদ্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ]

বিভীষণ : আরে ও পালোয়ানজি, একি হল—ষাট ষাট ষাট।

[সকলের উচ্চহাস্য]

রাম : কি হে সুগ্রীব, তোমার যে দেখছি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ : আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম : যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই।

জাম্বুবান : আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ—

রাম : আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান : যোদ্ধা বলে যোদ্ধা—ঢাল নেই তলোয়ার নেই থামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ : আমি বরাবরই বলে আসছি—

সুগ্রীব : দ্যাখ ! তোর ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম : রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি ?—
পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খাদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান : আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে--তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাং পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।

[বাহিরে গোলমাল]

রাম : এত গোলমাল কিসের হে ?

সুগ্রীব : রাবণ ইদিকে আসছে না তো ?

জাম্বুবান ও বিভীষণ : অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ ?

বিভীষণ : আমার ছাতাটা কোথায় গেল ? ব্যাগটা ?

জাম্বুবান : হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে ? আমায় কাঁধে নিতে পারবি ?

[জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা। দূতের প্রবেশ]

দূত : শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

[সকলে আশ্বস্ত]

রাম : এত হল্লা করে আসছে কেন ? চেঁচাতে বারণ কর।

দূত : আজ্ঞে তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, একরকম আসছেনই বটে—মানে তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান : লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও তো—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায় নি।

[লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান]

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বিক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ড্যাঙায় বোয়াল মাছ রে !
অনেক কষ্টে রইল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিচ্ছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না !
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে তো ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো—

রাম : হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়— [রামের মূর্ছা]

বানরগণ : হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)।

[বানরগণের মাঝে মাঝে কলাভক্ষণ]

জাম্বুবান : এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি ?

সুগ্রীব : হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিল ?

হনুমান : আমি বাতাসা খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব : ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি ?

(গান) শোন রে ওরে হনুমান
হও রে ব্যাটা সাবধান
আগে হতে পষ্ট ব'লে রাখি।
তুমি ব্যাটা জানোয়ার
নিষ্কর্মার অবতার
কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি ॥
কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে
ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোন রে আদেশ মোর

এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান : (স্বগত) মোটে আট আনা ?

বিভীষণ : তারপর, তোমাদের মতলব কি স্থির হল ?

সুগ্রীব : এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে : হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক কথা! ঠিক কথা!

[জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান]

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল
(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চোদ্দ হাজার ঢোল॥
কাজ কি ব্যাটার বেঁচে, (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুনকালি, (তারে) চিমটি কাটো খালি
(তার) চৌদ্দপুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল কর আরো যে যেরকম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো॥

[রামচন্দ্রের মূর্ছাভঙ্গ ও গত্রোত্থান]



বিভীষণ : এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন !

রাম্ : তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা কল্‌লে ?

সকলে : ঐ যা ! ওষুধপত্রের তো কিছু ব্যবস্থা হল না ?

রাম : মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা ?

বিভীষণ : মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব : ব্যস ! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর কি ?

সকলে : মন্ত্রীমশাই ! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না।

[সকলে মিলিয়া জাম্বুবানকে ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি]

বিভীষণ : বাবা ! এ যে কুম্ভকর্ণের এক কাঠি বাড়া !

জাম্বুবান : (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক, বেরসিক, বেআক্কেলে, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত !

সকলে : রাগ করবেন না—আহা, রাগ করবেন না কথাটা শুনুন—

(গান) আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না ?
সঙ্কটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না ?
সর্ব কর্মে অষ্টরম্ভা হর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
উল্টো কিছু বলতে গেলে বিটকেল বিটকেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এমনি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে !
হাঙ্গামা দেখে হটলে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি ?
ভেবেই দেখ এমনি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি ?
মুখ্যু মোরা আক্কেল-শূন্য একেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুদ্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিচ্ছু নেইকো চটবার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পদ্মে ॥

হনুমান : (স্বগত) হ্যাঁরে আমার লেজ পাড়িয়ে দিলি ?

রাম : বুঝলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ... খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান : আজ্ঞে হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটারা খালি ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই'—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়ল নাকি?

রাম : হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান : (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা প্রেশক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান : আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান : না, না, এত দেরি করলে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান : আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব : ব্যাটা, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান : না, ওষুধগুলো এখনি দরকার।

হনুমান : আঃ! হোমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান : যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী—এইসব গাছের শিকড় আনতে হবে।

হনুমান : আমি ডাক্তারখানা চিনি নে।

জাম্বুবান : আ মরণ আর কি! একি কলকাতার শহর পেয়েছিস নাকি যে বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলেস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে জানিস তো?

হনুমান : কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান : ব্যাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা কৈলেস পাহাড় জানিস নে?

হনুমান : ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান : যাবি নে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিস নে।

হনুমান : আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম : আহা, যারে যা, আর গোল করিস নে—নে বকশিশ নে।

হনুমান : যো হুকুম।

[হনুমানকে রামচন্দ্রের কলা প্রদান। কুর্নিশ করিতে-করিতে হনুমানের প্রস্থান]

জাম্বুবান : তারপর রাত্তিরের জন্য সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম : কেন! রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান : তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে তো! তা ছাড়া, হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে : তা তো বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়।

সুগ্রীব : (স্বগত) হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

(গান)
আমার বচন শুন বিভীষণ
করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর
সমর সত্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক
তোমার অধিক কেবা আছে আর
(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসান
মুশকিলে আসান প্রসাদে তোমার—

সকলে : ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ : তাই তো। মুশকিলে ফেললে দেখছি।

সুগ্রীব :
শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে
বীর বিভীষণে কর সেনাপতি
(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে
যদি যায় মরে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে : তা তো বটেই—কিচ্ছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান : বেশ তো! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো

করে পাহারা দিও। কোন ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখো যেন ঘুমিও না।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বিভীষণ : ইকী গেরো ! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি !

(গান)

বিধি মোর ভালে হায় কি লিখিল
আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সঙ্কটেতে ঘোর।
জাম্বুবান ব্যাটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি
তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে ?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সঙ্কটে কি উপায় হবে ?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা করো তোমরা সকলে।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির-প্রাঙ্গণ। বিভীষণের পাহারাদারী,
মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি।

বিভীষণ : জাম্বুবান বলছিলেন, দেখ যেন ঘুমিও না—বাপু, এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি। (পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি)—তবে এ পর্যন্ত যখন কোন দুর্ঘটনা হয় নি—তাতে আমার কিছু-কিছু ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়তো বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ...যাক্! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের তো ইদিকে আসবার কোনই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই-বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা তো আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না।

[বিভীষণের উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ]

জাম্বুবান : দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্!

বিভীষণ : (লাফাইয়া উঠিয়া) কে রে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করেছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোই নি।

জাম্বুবান : হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, সত্যি করে ঘুমোই নি।

বিভীষণ : তুই টের পাস নি?—আমি মিট-মিট করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান : না-না—মিট-মিট করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

[জাম্বুবানের প্রস্থান]



বিভীষণ : ব্যাটা তো ভারি জোচ্চোর ! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল !

[বিভীষণের পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা। যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রথম দূত : হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো ?

দ্বিতীয় দূত : আরে, হ্যাঁরে হ্যাঁ, এতদিন কাজ করছি, একটা বাড়ি চিনতে পারব না ?

প্রথম দূত : তোকে কি বাতলিয়ে দিয়েছিল বল্ তো ?

দ্বিতীয় দূত : আমাকে বলে দিয়েছে যে, সেই ডানদিকের উঠোনওয়ালা বাড়িটায় যাবি।

প্রথম দূত : ডানদিক তো এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে তো ঠিকই এসেচি—

দ্বিতীয় দূত : হ্যাঁ, চল—মড়াটা খুঁজে দেখি !

[অন্বেষণ করিতে করিতে দূতদ্বয়ের বিভীষণোপরি পতন]

বিভীষণ : কে রে ! কে রে !

[দূতদ্বয়ের লাফাইয়া তিন হাত দূরে গমন]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : এটা কি আছে রে ! এটা কি আছে রে !

দ্বিতীয় দূত : ও বাপ্পো—এ মানুষ আছে নাকি ?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : ও বাপ্পো—মানুষ ? জীয়ন্ত মানুষ ?

[দূতদ্বয় ভয়ে কম্পিত]

দ্বিতীয় দূত : কই রে কিচ্ছু তো বলছে না !

প্রথম দূত : তাহলে বোধ হয় কিচ্ছু বলবে না।

দ্বিতীয় দূত : হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা ! ওকে জিগগেস কর তো ?

প্রথম দূত : তুই জিগগেস কর।

দ্বিতীয় দূত : তুই জিগগেস কর না। আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত : মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই—

দ্বিতীয় দূত : আমরা মশাই গরীব বেচারা মশাই—

বিভীষণ : (স্বগত) এ তো মজা মন্দ নয় ! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত : চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই।

[দূতদ্বয়ের পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে।

(গান) দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো ?
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো ?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো !
এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হলে তো না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো ॥

বিভীষণ : ভাগ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

[উভয় দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ]

প্রথম দূত : হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা ? খালি হাতে গেলে যমরাজা কাউকে আস্ত রাখবেন না।

দ্বিতীয় দূত : তাই তো ! তাই তো ! এ তো ভারি মুশকিল হল—কি করা যায় বল্ দেখি ?

প্রথম দূত : আয় না, আমরা ও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

দ্বিতীয় দূত : (গান) যখন পরাজয় হল অনিবার্য
তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য ?

প্রথম দূত : তবে তো মুশকিল উপায় কি হবে ?
সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে ?

দ্বিতীয় দূত : আমিও তাই বলি লড়াইয়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই !

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : হায় কি ঘটিল, হায় কি ঘটিল
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল !

বিভীষণ : ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাবকিয়ে রোগা করে দেব।

[দূতদ্বয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজা, আমাদের কিছু দোষ নেই—ঐ এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

[যমের প্রবেশ]

বিভীষণ : এই মাটি করেছে—এখন উপায় ? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে রাম রামবে। উভয় সঙ্কট। যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (সদর্পে) তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিস নে ? আমি থাকতে তুই ঢুকবি ?

[যমের অগ্রসর হওয়া]

দ্বিতীয় দূত : ওরে এবার লড়াই বাঁধবে—

প্রথম দূত : হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত : (বিভীষণের প্রতি) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত : হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ, ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি হবে।

বিভীষণ : তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস ?

যম : (আবৃত্তি) কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি ॥
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,—
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি ॥
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে ॥
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন ॥

[পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ ।

হনুমান : জয়, রামের জয় !

[যমের মাথায় হনুমানের পাহাড় স্থাপন । যমের পতন]

প্রথম দূত : ওকি রে !

দ্বিতীয় দূত : ঐ যা ! চাপা পড়ে গেল !

প্রথম দূত : তাই তো রে, চাপা পড়ল যে !

দ্বিতীয় দূত : (সকাতরে)—হ্যাঁরে, আমার মাইনে কে দেবে ?

প্রথম দূত : তাই তো ! আমারও যে পাওনা আছে !

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত : ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, আমরা যে ধনে-প্রাণে মলুম গো—(হনুমানের প্রতি)—পালোয়ান মশাই গো, সর্বনাশ কললেন গো ! হায়, আমাদের কি হল গো—

প্রথম দূত : (গান) ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি

দ্বিতীয় দূত : মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম দূত : আহা দেখ না ব্যাটা হল নাকি ?



দ্বিতীয় দূত : ওর চুল ধরে দে না ঝাঁকি।

প্রথম দূত : এই বিপদকালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—অ্যাঁক্!

[হনুমান কর্তৃক দূতদ্বয়ের গলা পাকড়ানো]

হনুমান : ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেঁধেছে।

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান]

বিভীষণ : এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

[হনুমানের প্রস্থান। লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া হনুমানের সহিত সকলের প্রবেশ]

সকলে : ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান : আজ্ঞে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান : ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধ নিয়ে এসেছিস ?

হনুমান : আজ্ঞে, গাছ চিনি নে। আর ঐ নীচেরটা—যমরাজা।

সকলে : আরে আরে করেছিস কিরে ব্যাটা ? করেছিস কি ?

জাম্বুবান : থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছু গতিক করে নিই, তারপর দেখা যাবে—

(ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ]

সকলে : বা, বা ! কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ ! কি সাফাই ওষুধ রে !

হনুমান : হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ তো !

সকলে : তাই বল। স্বদেশী না হলে কি এমন হয় ?

জাম্বুবান : হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

[পাহাড় সরাইয়া হনুমানের যমকে মুক্তিদান]

যম : (চোখ রগড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি)—সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ : তা না তো কি ? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে ?

যম : আজ্ঞে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি—

[যমের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ : হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান : তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি তো।

বিভীষণ : আমি পাহারা না দিলে ওষুধে কি হত রে ? ওষুধ আনতে আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমারই তো বাহাদুরি।

সুগ্রীব : অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে তো বিভীষণ পাহারা দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই তো যমদূতগুলো আটকা পড়ল !

জাম্বুবান : আরে ব্যাটা, ওষুধের ব্যবস্থা করল কে ? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে গেছিল কোথায় ?



রাম : হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিগ্‌গেস করলে তুমি হয়তো এখনো পড়ে নাক ডাকাতে।

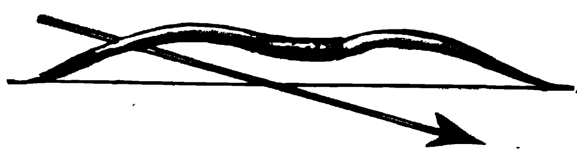
লক্ষ্মণ : আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এ-সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না—আর তোমরাও বিদ্যা জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান : যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক নিদ্রার চেষ্টা দেখ—তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচব !

হনুমান : আমায় কিছু বকশিশ দেবে না ?

বিভীষণ : হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।
প্রথম : আমার কথাটি ফুরোলো
দ্বিতীয় : নটে গাছটি মুড়োলো
তৃতীয় : ক্যান্ রে নটে মুড়োলি
চতুর্থ : বেশ করেছি—তোর তাতে কিরে ব্যাটা ?
সকলে : ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থো সর্গঃ]



যবনিকা



রিম-ঝিম

কালীপ্রসন্ন শর্মা

পাত্রগণ

রিকি ॥ আমেরিকাবাসী মহিলা।

মিকি ॥ ঐ যমজ বোন। শ্রীরামপুর নিবাসী।

রিম ও ঝিম ॥ যমজ ভাই—মিকির ছেলে।

টুন ॥ রিম ও ঝিমের বোন।

বেচু ॥ রিম-ঝিমের বন্ধু।

ফিরিওলা ॥

প্রথম দৃশ্য

[একটি সহরতলীর বাড়ী। বসবার ঘর—ঘরের অধিষ্ঠাত্রী মিকি বসু। ঘরটি মধ্যবিত্ত সম্পন্ন গৃহস্থের। আসবাবপত্র রুচির পরিচায়ক। ঘরের একদিকে রিম-ঝিমের মা মিকি টুকিটাকি কাজ করছেন। সামনে কার্পেটের ওপর রিম একটা স্টিরিও খুলে সারাবার কাজ করছে।]

মা : রিম !

রিম : (উত্তর নেই—একমনে একটা স্টিরিও চালাবার চেষ্টা করছে।)

মা : রিম।

রিম : হুঁঃ।

মা : এদিকে এস।

রিম : ওখান থেকেই বল না। কাজ করছি—

মা : আমার কাছে এস। কাজ থাক্।

রিম : ওই জন্য রাগ হয়। যতি আসবে,—বিকেলে পার্টি। এটাকে —এটাকে ঠিক করব না ? ফাটা আওয়াজ হচ্ছে। আজ পার্টি।

মা : পার্টি ফার্টি হবে না এখানে।

রিম : কেন মা ?

মা : অন্য কাজ আছে।

রিম : আমি পারব না, ঝিমকে বল।

[অন্য ঘর থেকে ঝিম—'কাল আমার পরীক্ষা আমার দ্বারা হবে না'।]

মা : (বিরক্ত হয়ে)—আমার কথাটা শোনোই না।

রিম : শুনছি, বল। ঐ তো বলবে, বাজারে যা—এটা আন, ওটা কর—

মা : বাজার-টাজার নয়। তোমার রিকি মাসী আমেরিকা থেকে

ফিরেছে ১৬ বছর পরে—তখন তোমাদের জন্মও হয় নি। আছে ২-লভিন কোর্টে—হাওড়ায়।'

রিম : চৌধুরীবাড়ী ?

মা : না, ওর ভাসুরের বাড়ী। তোমাদের যেতে বলেছে।

[ঝিমের প্রবেশ]

ঝিম : মা, আমি যাব ?

মা : কাল পরীক্ষা না ? আজ শুধু রিম যাক্।

[টুনের প্রবেশ—১২ বছরের মেয়ে]

টুন : মা, আমি যাব।

মা : তা নয়তো আর ষোল কলা পূর্ণ হবে কি করে ? না, আজ রিমই যাক্; পরে আমি সবাইকে নিয়ে যাব। আজ আমি যেতে পারছি না।

ঝিম : মা, এই সেই রিকি মাসী, যে খুব চমৎকার পিঠে বানায় ?

মা : (হেসে)—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।

রিম : মা, আমার পার্টি ? আজ ঝিম গেলেই তো হয়। পরীক্ষা না কচু! এমনিও পড়বে না, ওমনিও পড়বে না। মাষ্টারমশাই বলেন, ওর মাথায় সাঁতরাগাছির ওল আছে—খালি ঝাঁঝায়।

ঝিম : কি বললে ? সাঁতরাগাছির ওল ? আর মাষ্টারমশাই যে বলেন তোমার মাথায় আছে নিরেট গোবর ? ও থেকে বড় জোর গোবর গ্যাস পাবে।

রিম : খবরদার।

ঝিম : সাবধান।

[দু'জন দু'জনের চুল ধরল]

টুন : যাক্ লেগে যাক্ হাই রে, রিমঝিম ঘন ঘন রে—

মা : (দুই ছেলেকে আলগা করবার চেষ্টা করতে করতে)—এই রিম! এই ঝিম! কি হচ্ছে ?

[কে কার কথা শোনে ? এবার ঘুষোঘুষি চলল।]



টুন : যাক্ লেগে যাক্ নারদ বাবা,—রিনিক্ ঝিনিক্ ঝিম—

রিনিক্ ঝিনিক্ ঝিম
তানানা তানানা
গুর গুর গুর
ঢোলক বাজানা রিম—
ঠেকেট ধাতিনা
মার কিল ঘুষি—
রক্ত ঝরুক নাকে—
যুদ্ধ, না রিম ঝিম—

[দু'ভাই হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়ে টুনের দিকে ছুটল। মা হেসে মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। রিমঝিম ফোঁস ফোঁস করতে লাগল]।

রিম : থাকো না, কতক্ষণ মায়ের কোলে থাকবে ! একলা পাব না ?

টুন : মা, ঐ দেখ – ভয় দেখাচ্ছে।

মা : ঢের হয়েছে। এবার কাজের কথা। ঝিম, পড়তে যাও।

[গজ্ গজ্ করতে করতে ঝিমের প্রস্থান। মা টুনকে চেষ্ট অফ ড্রয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন।]

মা : রিম ! লক্ষ্মী বাবা—!

রিম : না, আমি লক্ষ্মী না। ব্যাকরণ ভুল করছ কেন ? সুবোধ বলতে পার :

মা : (হেসে)—আচ্ছা আচ্ছা। এই চিঠি দিচ্ছি—তুমি রিকি মাসীর কাছে যাও কলভিন কোর্টে। আজ ওর ছেলের জন্মদিন। সে তো আসেনি। তোমাদের একজনকে না পেলে দুঃখু পাবে। বিকেল চারটেয় ফিরবে।

রিম : বেশ, দাও চিঠি। যাচ্ছি।

মা : রিকি মাসী ভালো সুফল্ তৈরি করে—

রিম : বললাম তো যাচ্ছি—

মা : স্টেরিও রেকর্ড এনেছে—

রিম : ওঃ ! যাই।

মা : ও কি ! জামা বদলাবে না ?

রিম : রিকি মাসি কাকে চান ? আমাকে, না আমার জামাকে ?

মা : আয় বাবা, একটু ভদ্রসভ্র করে দিই ।

রিম : আমি বেশ ভদ্রই আছি । যাচ্ছি । [প্রস্থান

মা : (পথের দিকে তাকিয়ে)—কি যে হ'ল এখনকার ছেলেরা ! (মনে ম হেসে)—ভালোই তো, ওর বাবার মত ডাম্বেল নয় ।

[রিমের পুনঃপ্রবেশ

রিম : মা, একটা কথা ।

মা : আবার কি ?

রিম : আশীর্বাদ । সুখী হও ।

মা : (হেসে ফেলে)—তবে রে !

রিম : আর মা—

মা : বড্ড ফাজিল হয়েছ ।

রিম : একটু হাসো । সামান্য, বেশি নয় ।

[মা লাঠি নিয়ে তাড়া করে টেবিলের চারদিকে ঘুরতে থাকেন]

রিম : হেসে মোটা হও । ওঃ, তোমার তো মোটা হওয়া চলবে না না বাবা, তুমি স্লিমই থাকো । নয়তো দু'হাতে নাগাল পাবো না ।

টুন : ধরবো মা ?

রিম : চুপ শাঁখচুন্নী !

[চুলের গোছা ধরে টেনে রিম বেরিয়ে গেল



দ্বিতীয় দৃশ্য

হাওড়া ষ্টেশনের কাছ বরাবর। রিম ধীরে ধীরে চলেছে। কে মাসী চেনে না, জানে না। মা'র যেমন কাণ্ড! মা-মাসীও তো যমজ বোন। মনে মনে হাসল রিম। আচ্ছা, দেখাই যাক না, কি রকম ষ্টিরিও। হঠাৎ স্কুলের এক বন্ধুর সাথে দেখা। ওরা একসঙ্গে পড়ে। এক পাড়ায় বাড়ী। নাম বেচু।

রিম : হাই ক্লষ্ট্রোফেবিয়া!

বেচু : হাই শিজোফ্রেনিক!

রিম : এই ট্রেনে এলি?

বেচু : ইয়া। তুই?

রিম : আম্মো। যাচ্ছিস কোথায় ?

বেচু : যাব হাওড়া ময়দানে। সার্কাসের টিকিট ছিল একটা দিদির কাছে, ও যাবে না। বলে, তুই যা। সার্কাস আমার মোটেই ভাল লাগে না। তা বড় বড় দু'টো স্ল্যাব্ চকোলেট দিল। এই নে।

[রিমকে দিল একটা]

রিম : ফাইন ! তোর দিদি একটা খাসা দিদি। আমার তো সার্কাস ভালোই লাগে। তোর দিদি যে দিয়ে দিল টিকিট ? ও তো রাম কিপটে রে !

বেচু : ওর বান্ধবী এসে গেল যে !

রিম : অঃ, বুঝতে পেরেছি। একেবারে ঝিকটি মিকটি কুক। তোকে বিদায় করবার মতলব।

বেচু : তুই চল্ না, পয়সা আছে।

রিম : না রে, উপায় নেই। মাসী এসেছে ওভারসীস থেকে ষোলো বছর পরে। সো রিম, গো অ্যাণ্ড পে রেসপেক্ট। তার ওপর মা'র যমজ বোন। বাবা বলেন, মা যা ভাবে মাসী তার উল্টোটা ভাবেন। নট্ টুইন্ লাইক্। যমজের মত নয়। অর্থাৎ অনেকটা ঝিমের মত। দেখে আসি কি চীজ্।

বেচু : সার্কাসে যেতে মন নেই। আচ্ছা, আমি যাব তোর সঙ্গে ? বলবি আমার ভাই ঝিম।

রিম : ধেৎ। ধরে ফেলবে !

[ফিরিওয়ালার প্রবেশ]

ফিরিওয়ালা : (গান) সুঁদরী সোহাগ কেশতৈল
নিতে ভুলো না,
মাথা ধরা যায় গো সেরে—
মাথার বেদনা।
বড় শিশি ষোলো আনা,
নমুনা আনা জোড়া ;

মাথা ধরা যায় গো সেরে—

মাথার বেদনা।

বেচু : বেটা, কেশতৈল বেচবি তো ওই স্কুলের মেয়েদের কাছে যা না!

ফিরি : খোকাবাবু, মেয়েদের থেকে তো তুমার বড় চুল—লাও না সেম্পুল।

রিম : বেরো।—(ফিরিওয়ালার প্রস্থান)—শোন্ বেচু, মেয়েদের চিনিস না তো? বিশেষ করে সে যদি অচেনা মাসী হয়। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) —দি আইডিয়া! ইউরেকা!

বেচু : তুই একটা ডিগ্‌মিডেটিস্! হঠাৎ কি হ'ল তোর? ইষ্টিমকাইল্ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস?

রিম : দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চার। বেচু, শোন্।

বেচু : বল্। মনে হচ্ছে খিস কাথামিন বলশেরিক ঘুশ্চামিন!

রিম : রিকি মাসী আমাকে কখনো দেখে নি। আমার জন্মের আগেই কনেকটিকাট্ গেন। চেনে না। তুই হয়ে যাবি রিম আর আমি তোর টিকিট নিয়ে হাওড়া ময়দান। ঠিক আড়াই ঘণ্টা বাদে ঐ বাড়ী গিয়ে আমি রাস্তা থেকে চাক্ চিচিঙ্গা হুইসিল দেব—তুইও বেরিয়ে চলে আসবি।

[আর এক ফিরিওলার প্রবেশ]

ফিরিওয়ালা : এই যে দেখছেন আকন্দসুধা। খেলেই সুখের নেশা। বলছি দশ ফুইসায় দুটা পোয়া যায়।

রিম : ভাগ বেটা—

ফিরি : আপনারা আমার কথা শুনি মনে কত্তি পারেন আমার বাড়ী থুইলসা গ্রাম কইলাত্তা—তা নয় তা নয়। আমার মোকান চুইট্টগ্রাম। আমি রিফিউজি—বাস্তুহারা। আকন্দসুধা দশ ফুইসায় দুটা বড়ি পাবান—আকন্দসুধা চাই—? [প্রস্থান]

বেচু : তুই পাগলা নাকি? তোর মাকে চিনি। কান দু'টো আলগা করে দেবে না?

রিম : আরে, ধরতে পারলে তো ? আমাকে তো দেখে নি ! ষ্টিরিও দেখাবে, স্নুফ্‌ল্ খাওয়াবে। আরো কত কি—

বেচু : কিন্তু—

রিম : আর কিন্তু নেই। দে টিকেটটা—চকোলেটটাও।

বেচু : একটা দিলুম তো—

রিম : সার্কাস দেখবার জন্য দু'টো চকোলেটই দিতে হয়। ওটা ছাড়তে হবে। (চকোলেট কেড়ে নিয়ে)—মাসী খুব ভালো আমেরিকান কুক্। খাবি আর হাসবি। ইট্‌স্ এ ডীল্।

বেচু : অগত্যা। ধরা পডলে তোর মা—

রিম : আরে ছাড় ওস্তাদ ! আমার মা'র নিন্দে করলে আমি ফায়ার হয়ে যাব। তোকে সব বুঝিয়ে দি—

(দুজনের পরস্পর চুপে চুপে কথা)

রিম : বাই ক্লস্ট্রোফোবিয়া !

বেচু : বাই শিজোফ্রেনিক !

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান। এতক্ষণ ষ্টেশনে নানা রকম চরিত্র আনাগোনা করছে। যাত্রী, ভিখারী, হকার ইত্যাদি।]

তৃতীয় দৃশ্য

রিমের মাসীবাড়ীর লিভিং রুম। দেখলেই মনে হয় ভদ্রমহিলা প্রবাসী। নানারকমের টুকিটাকি জিনিষ। ষ্টিরিও আছে—আছে রেডিওগ্রাম। ইয়াংকি সভ্যতার কিছু নিদর্শন—কিছু ভারতীয় কারুকর্ম। মাসীর পরনে কিমনো—ঠিক রিমের মার মতই। একটা ছোট টি ট্রলি—তার ওপর কেক। মাসী এটা ওটা হাতের কাজ করছেন—এমন সময় বাইরে দরজায় কে বেল টিপেছে।

মাসী : ঐ বুঝি রিম এলো—হ্যালো ডার্লিং কাম ইন্। (কোন শব্দ নেই—মাসী দরজা খুলে উঁকি দিতেই)—এসো এসো—লজ্জা কিসের ? ও তুমিই রিম ! হাউ ওয়াণ্ডারফুল। মিকির ছেলে !

বেচু : আরে মাসী যে—তুমি এখানে ?

মাসী : তবে আমি কোথায় থাকব আশা কর ?

মাসী : (চুমু খেয়ে)—সিট্ ডাউন মাই বয় ।

বেচু : (স্বগতঃ—কি সর্বনাশ, এতো মিকি মাসীর বোন ! কিমনো অবধি ।)—না, আমি ভাবছিলাম তুমি তো মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে উঠেছ—

মাসী : দুর পাগল—হাউ কুড আই ? আমার ভাসুরের ফ্ল্যাট থাকতে অন্য জায়গায় উঠলে রক্ষে আছে—I would be Tarred and feathered. এত দেরী হল কেন রে ? মিকি ভালো আছে ? কখন আসবে ?

বেচু : ভা—ভা—ভালোই আছে । (স্বগতঃ—সর্বনাশ মিকি মাসীও আসবে নাকি ?)—মাসী, আমি একটু ঘুরে আসছি—

মাসী : রাবিশ ! কোথায় যাবি ? এই নে আইসক্রীম আর পেষ্ট্রি । তোদের কলকাতায় আইসক্রীম বাপু ভালো নয় । তাই আমি নিজেই তৈরী করেছি । (প্লেট থেকে বেচু আইসক্রীম খাচ্ছে না নিম ঝোল খাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না)—কেমন লাগছে রে ?

বেচু : ডি-ডি-ডিলিশিয়াস !

মাসী : তবে ফেলে রাখছিস ? খাবি না—পেষ্ট্রী ?

বেচু : খিদে নেই মাসী—এই তো মা খাইয়ে দিয়েছে—(স্বগতঃ—কি করিরে বাবা !)

মাসী : (আশ্চর্য্য হয়ে)—সে কি রিম ? মিকি বলে দিল তোকে বেশী না খাওয়াতে—বলল কি না তুই একটা ক্ষুদ্র রাক্ষস ! আর এই তোর খাওয়া হল !

বেচু : খাচ্ছি মাসী—

[সব শুদ্ধ গলায় দিতেই বিষম খেলো

মাসী : ওকি ? ষাট ষাট বিষম খেলো, দেখ তো—এই নে জল খা !

বেচু : (কাতর ভাবে)—মাসী শরীরটা ভালো নেই—আর খাবে না ।



মাসী : কিছু হয়নি—নে এই সরবতটা খা—মনে হচ্ছে নিমের সরবত খাচ্ছিস। নে এবার বোস সব খবর শুনি—বাবা কোথায়?

বেচু : বাড়ীতেই আছে—

মাসী : (আশ্চর্য্য হয়ে)—বাড়ীতেই আছে? তবে যে মিকি বলল বাঙ্গালোরে লেকচার দিতে গেছে? কি ব্যাপার—

বেচু : ও হ্যাঁ—তাই হবে বাঁধা ছাঁদা করতে দেখেছি সেদিন—

মাসী : বাঁধা ছাঁদা? গ্রেসাস্! ছেলে বাঁধা ছাঁদা করতে দেখছে। এ দেশটা এতো এগিয়ে গেছে? ছেলে বাপের খবর জানে না?

বেচু : (স্বগতঃ—উঃ কি বিপদ!)—বাবা যখন যান আমি স্কুলে ছিলাম।

মাসী : মাদ্রাজ মেইল তো রাত্রে যায়—অন্ততঃ তাই যেতো—তখন স্কুলে ছিলি?

বেচু : (স্বগতঃ—কি ডাঁহাবাজ মাসী রে!)—আমার তো সন্ধ্যায় স্কুল।

মাসী : যাকগে—আর কি খবর বল ?

[বেচু নিরুত্তর]

মাসী : ভেরী কুইয়ার ! কি হয়েছে ?

বেচু : জ্বর জ্বর মাসী, জ্বর-জ্বর লাগছে—

মাসী : দেখি দেখি—(বুকে পিঠে হাত দিয়ে)—না কিচ্ছু হয় নি। ষোল বছর ডাক্তারী করছি। আপাততঃ তোর মত সুস্থ শরীর কারুর নেই।

বেচু : ওরে বাব্বা আপনি—তুমি ডাক্তার ?

মাসী : তোর মা'ও তো ডাক্তার—আমরা একসঙ্গে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করি—

বেচু : (স্বগতঃ—সর্বনাশ ! ইস্‌স এতো জানতাম না। ওরে বাবা, রিম আমায় উদ্ধার কর !)—সত্যিই মাসী, শরীরটা ভালো লাগছে না—পেট কামড়াচ্ছে।

মাসী : হুঃ ! (উঠে গিয়ে ওষুধের বাক্সো থেকে ট্যাবলেট বার করে)—নে এটা খেয়ে নে। দাঁড়া জল আনছি।

বেচু : (জানালা দিয়ে ওষুধ ফেলে দিয়ে)—নিয়েছি মাসী। জল লাগবে না !

মাসী : হোয়াট এ বয় !

মাসী : (শেলাই করতে করতে)—দাদা কোথায় আছে জানিস ?

বেচু : (স্বগতঃ—দাদা ? মিকি মাসীর দাদা আছে নাকি ? জীবনে তো দেখিনি।)—বোধ হয় কলকাতায়।

মাসী : (দাঁড়িয়ে উঠে)—কলকাতায় ? কবে এসেছে ? আমি জানিনা তো ! মিকি কিছুই বলেনি। কবে এলো ?

বেচু : (মরীয়া হ'য়ে)—মাসী, ও মাসের দু তারিখে এসেছে। আমাদের বাড়ী এখনো আসেনি তাই ঠিক জানিনা, এখন কোথায় আছে।

মাসী : যদি আসবেই তবে আমার সাথে তোর জিন্‌স্ আর ঝিমের ক্যামেরা দিল কেন ? একটু বোস।

[ভেতরে যান]

বেচু : (স্বগতঃ—শিজোফ্রেনিক। তুমি গেলে ! কটা হল ? পালাই না এবেলা !)

[দরজার দিকে এগুবে। রিকি মাসির পুঃনপ্রবেশ]

মাসী : আরে, কোথা যাচ্ছিস্—

বেচু : যাচ্ছি না তো !

মাসী : এই দেখ, তোর জিনস্ আর এই যে ঝিমের ক্যামেরা। এটা দাদা মন্ট্রিল থেকে পাঠিয়েছে। য়ুরোপ যাবার কথা ছিল, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম দাদা কোথায়—

বেচু : সে আমি জানিনা—

মাসী : দেখবিনা জিনিস্টা—

বেচু : (স্বগতঃ— আর জিনস্)—দাও।

মাসী : এই যে বিট রেকর্ড—একটা তোর—এইটে রোলিং স্টোন—তোরা অনেক এগিয়েছিস আমি জানতুম না। এসব রেকর্ড এখানে চলে ?

মাসী : যা—ঐতো স্টিরিও, চালিয়ে দেখ—শোন গানটা—

বেচু : পরে দেখবো মাসী—

মাসী : পরে ? মিকি বলল, স্টিরিও নিয়ে তুই পাগলা—

বেচু : (স্বগতঃ—গেছি। আমি তো স্টেরিও চালাতেও জানিনা) তুমি চালি দাও—

মাসী : (চালাবে) —কি দেব রে ? শোন, ডেবি রেনল্ডস্।

বেচু : দাও !

[মাসী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে— মিকির ছেলে

মাসী : তোরা ক্লাসিক্যাল গান শুনিস ?

বেচু : (উৎসাহের সঙ্গে)—নাতো—আমরা হিন্দি ফি . শুনি —রফি, কিশোর, লতা।

মাসী : কেন রবিশংকর, আলি আকবর ?

বেচু : (উৎসাহের সঙ্গে)—হ্যাঁ হ্যাঁ—ওদের ফিল্মের গান

মাসী : রবিশংকর, আলি আকবরের হিন্দী ফিল্মের গা গায় নাকি ? কখনো শুনিনি তো—দেশটা কি রকম বদলেছে . গুলিও—রিম, তুই কোথায় পড়িস রে ?

বেচু : ডন বসকো, লিলুয়া—(স্বগতঃ—এটাতো জানি)—ক্লাশ সিক্স।

মাসী : ঝিম্ ?

বেচু : ঐ এক সঙ্গেই—

[মাসী চুপ করে বসে ভাবছে। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে]

মাসী : একটু দাঁড়া—আমি ওপর থেকে আসছি।

[বাইরে গিয়ে দরজার লক লাগিয়ে যাবে। বাইরে থেকে তিনটে হুইসল।]



বেচু : (প্রায় কেঁদে) এই রিম ! বাইরে থেকে দরজাটা খোল—আমি পালাই।

[নেপথ্যে ঃ—'আসছি। দাঁড়া।' একটু পরে রিম ঢুকবে।]

রিম : ক্লস্ট্রোফোবিয়া !—ইয়ারকি পেয়েছিস ? কালকের টিকিট দিয়ে ভাঁওতা—মিথ্যে হয়রানী করলি—

বেচু : তুই তোর মাসীর আদর খা—আমি পালাই—কি মাসিরে বাবা, যেন জগত্তারিণী স্কুলের হেডমিষ্ট্রেস—

[দৌড়ে প্রস্থান]

রিম : বাঃ ! বেশ সাজানো তো—ঐ তো ফাইন ষ্টেরিও ! আরে আরে ! এটা তো— আরে রোলিং স্টোন ! মাসীকে চম্‌কে দিই। ষ্টিরিও চালিয়ে দিই। আরে এ তো জিনস্‌ ! টু ভাগে রিম ! দ্যাট্‌স মি ! পড়ে দেখি। নাঃ পরে। ক্যামেরাও ?

[মাসীর প্রবেশ]

মাসী : বল্লি যে স্টিরিও চালাতে জনিসনে—আরে ? গস্‌, হু আর য়ু ?

রিম : আমি তো রিম ! রিকি মাসী, এই নাও, মা চিঠি দিয়েছে। বিকেলে আসবে—

মাসী : ওঃ ! হু ওয়াজ দ্যাট আদার গাই ! আমার কি মাথা খারাপ হল ? তুমি কে ?

রিম : (আশ্চর্য্য হয়ে)—কেন আমি রিম ! মার হুকুমে তোমার কাছে এসেছি।

মাসী : ও ছেলেটি কে ?

রিম : ওঃ। proxy.

মাসী : ঐ দেখা যাচ্ছে। (মাসী জানালার কাছে গিয়ে)—ছেলেটাতো দৌড়োচ্ছে—

মাসী : যাও ধরে নিয়ে এসো।

রিম : না মাসী ও আসবে না। ভীষণ ভয় পেয়েছে। আরেকদিন

আনবো। আমার বন্ধু বেচু। ওকে ক্লস্ট্রোফোবিয়া বলে ডাকি। একটু বোকা আছে।

মাসী : আর তুমি ?

রিম : আমি শিজোফ্রেনিক্। মা বলে আমাদের তিনজনকে এক বাড়ীতে রাখলেই লুনেটিক এসাইলাম হয়ে যাবে।

মাসী : তোমাদের দেশে রবিশংকর-আলি আকবর ফিল্মে গায় ? হিন্দি ফিল্মে ?

রিম : ও বলেছে বুঝি ! বিচ্ছু জানেনা। গান শুনলেই নাকি ওর খুন করতে ইচ্ছে করে। এখন কি খাবার আছে দাও, খিদে পেয়েছে—

মাসী : উঁহু ! টেলিফোন করেছি। তোমার মা আসুক। কে আসল, কে প্রক্সি—আগে ঠিক হোক।

রিম : সে হবে না। তুমি ভালো সুফল্ তৈরী কর, হাম্বার্গার আইসক্রীম। বার কর। কোথায় ? জানো মাসী, ও আমাকে ঠকিয়েছে ! গতকালের টিকিট দিয়ে বলে যা সার্কাস দেখে আয়।

মাসী : (হেসে) —সার্ভ য়ূ রাইট ! নটি বয় !

[নেপথ্যে ঝিম টুনের গলা 'ও রিকি মাসী দরজা খোল', ঝড়ের মত টুন-ঝিমের প্রবেশ। সবাই এসে রিকি মাসীকে জড়িয়ে ধরবে।]

যবনিকা



Printed at India International Press, A-12/1, Naraina Industrial Area, Ph-I, New Delhi-28